রামায়ণ মননে বিবেকানন্দ

অভিজিৎ মাইতি

ভারতের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ। ভারতবর্ষের বহু হাজার বছরের জীবনচর্যার সারাৎসার ধরা আছে এই মহাকাব্যে। পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয়েছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর ঘরে ঘরে রামায়ণ পূজিত হয়েছে। রামায়ণে প্রকাশিত আদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, জীবনভাবনা, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষের মানুষ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণের মূলে আছে রামায়ণের গভীর প্রভাব। রেনেশাঁ- উজ্জীবিত আধুনিক ভারতবর্ষে তাই যখন জাতির পুরোধাপুরুষেরা ভারতবর্ষ নামক একটি অখণ্ড জাতিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, যখন অনুসন্ধান করেছেন ভারতের হৃৎপিণ্ডে বসবাস করছে কোন প্রাণভোমরা, তখন তাঁদের তাকাতে হয়েছে প্রাচীন ভারতের যেসব সম্পদের দিকে তার মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে রামায়ণ। স্বামী বিবেকানন্দ সেইসব পুরোধাপুরুষদের অন্যতম, তাই তাঁর ভাবনাবৃত্তে রামায়ণের স্থান ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিবেকানন্দ রামায়ণের ঐতিহ্যকে গভীর মননে অনুসন্ধান করেছেন এবং রামায়ণের যেসব ঐতিহ্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন সেগুলিকে তাঁর স্বপ্নের নবভারত-নির্মাণে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

স্বামীজীর শরীর এদেশের আলো-জল-বাতাসে নির্মিত বলেই রামায়ণের প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে শৈশব থেকেই এসে মিশেছে আলো-জল-বাতাসের মতোই। রামায়ণের অপূর্ব চিত্তাকর্ষক কাহিনি তিনি শৈশবে মায়ের কোলে বসেই শুনেছিলেন। তখন পাড়ায় পাড়ায় হত রামায়ণগান। বিলের মনে রামায়ণের প্রভাব এমনই অমোঘ হয়ে উঠেছিল যে, বাজার থেকে রাম-সীতার যুগলমূর্তি এনে তিনি বাড়ির চিলেকোঠার ছাদে স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। অবশ্য রামসীতার প্রতি তাঁর অপূর্ব ভক্তি থাকা সত্ত্বেও সহিসের মন্তব্য তাঁর শিশুমনে কিছুটা সমস্যা তৈরি করেছিল। নিজের দাম্পত্যজীবনে অসুখী সহিস নানা যুক্তি দিয়ে মন্তব্য করেছিল, ''বিয়ে করা বড় খারাপ।'' ফলে বিলে সিদ্ধান্ত করেন তিনিও কখনও বিয়ে করবেন না। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, তাহলে বিবাহিত রামসীতার মূর্তির কী হবে! মায়ের কাছে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়, জাঙ্গিপাড়া, হুগলি

সমাধান চাইলে মা পরামর্শ দিলেন রামসীতার পরিবর্তে শিবপূজা করতে। আর তারপরই ''সন্ধ্যার অন্ধকারে বীরেশ্বর ছাদে উঠিলেন এবং সীতারামের মূর্তি হাতে লইয়া ছাদের কিনারে দাঁড়াইলেন। সেটা নিশ্চয়ই তাঁহার এক দুঃখময় মুহূর্ত—সীতারামের মূর্তিকে বিদায় দিতে গিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়াছিল, হয়তো বা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পরমুহূর্তে সে যুগলমূর্তি নিম্নের কঠিন রাস্তায় পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। পরদিন বাজার হইতে একটি শিবমূর্তি আনিয়া সীতারামের আসনে বসাইলেন এবং আবার মুদ্রিতনয়নে সে মূর্তির সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হইলেন।''[১]

শৈশবের এই আকস্মিক সংশয় চিরস্থায়ী হয়নি। বরং পরিণত-মননে এবং পাশ্চাত্যজীবনের আদর্শের সংঘাতে রামায়ণকে বিবেকানন্দ আরও গভীরভাবে আশ্রয় করেছিলেন। প্রমাণ, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় রামায়ণের কথা বলেছেন, বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' নামক বক্তৃতার একটি অংশে রামায়ণ নিয়ে গভীর সব মন্তব্য করেছেন, দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের সময় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি প্যাসাডোনায় শেক্সপিয়র ক্লাবে 'রামায়ণ' নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত একটি সংস্কৃত স্তোত্রে রামচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সমন্বয়-সংযোগ দেখিয়েছিলেন।

দুই

স্বামীজীর রামায়ণ সংক্রান্ত আলোচনাগুলিতে রামায়ণের কাহিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর 'রামায়ণ' বক্তৃতায় আলোচিত রামায়ণ-কাহিনির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হয়ে ওঠার কাহিনির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, দর্শন ও তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। এক, ভারতীয় সমাজে নৈতিক জীবনের মূল্য অত্যন্ত বেশি। স্বামীজী গল্পের মধ্যে বলেছেন, দস্যু যখন নারদের কথায়, তার পাপের ভাগ পরিবারের কেউ নেবে কী না জিজ্ঞাসা করতে প্রথমে বাবার কাছে গেল তখন তার বাবা ছেলের জীবিকার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করল। দস্যু মায়ের কাছে গিয়ে সব কথা জানাতে মা ছেলের নৈতিক অধঃপতনের কথা শুনে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। স্ত্রীও সকল কথা শুনে তাকে ত্যাগ করল। ভারত ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিজের প্রিয়জনকেও ত্যাগ করতে পিছপা হয় না। শুধুমাত্র এই ঘটনাতেই নয়, নৈতিক জীবন, মূল্যবোধের বিশুদ্ধতা রক্ষা ভারতবাসীর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অন্য ঘটনাতেও লক্ষ করা যায়। বানররা যখন অপহৃতা সীতার অলংকার প্রথমে লক্ষ্মণকে দেখিয়েছিল তখন সেগুলি সীতার কী না তা লক্ষ্মণ চিনতে পারেননি, কেননা ভারতে অগ্রজের পত্নীর বাহু বা গলার দিকে কখনও তাকিয়ে দেখতেন না অনুজরা।[২] ভরত মামার বাড়ি থেকে ফিরে রামের বনবাসের কথা জেনে নিজের মায়ের পরিকল্পনার বিপরীতে গিয়ে রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। রাম ফিরে না এলে তাঁর পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে নিজে প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।[৩] অগ্রজের পত্নীর প্রতি এই শ্রদ্ধা, ভাইয়ের জন্য এই আত্মত্যাগ নৈতিকতা, মূল্যবোধের অসামান্য দৃষ্টান্ত।

দুই, দস্যুর দৃষ্টিতে দেখলে পরিবার-প্রিয়জনের কাছে এ-ধরনের প্রত্যাখ্যান গভীর বেদনার। যে-পরিবারের প্রতিপালনের জন্য তার এরকম জীবিকা গ্রহণ সেই পরিবারই যে তাকে নির্দয়ভাবে ত্যাগ করতে পারে এ-বিশ্বাস তার ছিল না। এই বিশ্বাসভঙ্গে, ''দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত

হইল। সে ভাবিল : এই তো দেখিতেছি সংসারের নিয়ম!"[৪] সংসারে এভাবে বিশ্বাসভঙ্গতার ঘটনা পরিচিত হলেও মনে রাখতে হবে, মানব-সম্পর্কের মধ্যেকার এ-ধরনের বিশ্বাসভঙ্গতাই শেষ কথা নয়। রামায়ণেই চিত্রিত হয়েছে স্বামী রামের জন্য সীতার, অগ্রজ রামের জন্য অনুজ লক্ষ্মণের স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ; অগ্রজের প্রতি ভালবাসায় ভরতের স্বেচ্ছায় ক্ষমতাত্যাগ বা বানরদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের বন্ধুত্বের-বিশ্বাসের কাহিনি। কিন্তু একথাও ঠিক, সংসারের নানা ঘটনায়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মানুষ জেনে যায় ক্ষণস্থায়ী সংসারের অসারতার নিদারুণ অভিজ্ঞতাগুলি। সে-অভিজ্ঞতা কখনও নেমে আসে ক্রৌঞ্চযুগলের জীবনে ব্যাধের তীরের মতো অতর্কিতে, কখনও দশরথের জীবনে পত্নীর লোভের সংকীর্ণতা হয়ে, কখনও প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রামের ব্যক্তিজীবনে বিরাট শূন্যতারূপে, কখনও বা সীতার জীবনে সংশয়ের কুটিল-পাক হয়ে। এভাবে সংসারে নানা ঘটনায় 'মায়া' ভঙ্গ হওয়াই যেন ভবিতব্য। দস্যুর জীবনে সেই মায়াভঙ্গ হয়েছে পরিবারবর্গের নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে। তবে এই স্বপ্নভঙ্গেই সবকিছু শেষ নয়। এখান থেকেই জন্ম নেয় সেই দর্শনের যেখানে 'জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত' হয়। সংসারের ক্ষণস্থায়িত্বের অমোঘতা জানার পর অনভিজ্ঞ দস্যুকে অভিজ্ঞ নারদ বলতে পারেন,

''তুমি তো দেখিলে, পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে না, অতএব ঐ পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে; আর যে-দিন তুমি কপর্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। একমাত্র যিনি সুখদুঃখ, পাপপুণ্য সকল অবস্থাতেই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তুমি তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ যথার্থ ভালবাসায় বেচাকেনা নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।"[৫] সেই অহেতুক ভালবাসার সন্ধান দিয়ে দেবর্ষি দস্যুকে লক্ষ্যে পৌঁছনোর সাধনপ্রণালী শিখিয়ে দিলেন।

লক্ষণীয়, পরিবারের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার পর ভগ্ন-বিশ্বাস, যন্ত্রণাবিদ্ধ দস্যুর নিদারুণ একাকিত্বেই কাহিনি শেষ হল না। তা যদি হত তাহলে তা একটি সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু ট্র্যাজেডির জ্বলন্ত অশ্রুবাষ্পে তপ্ত বালুকাবেলায় জীবনের মুখ থুবড়ে পড়াটাই ভারতীয় জীবনের অন্তিম ভবিতব্য নয়। সংসারের অসার অস্তিত্বের মাঝে মানুষের মধ্যের দৈবী সম্ভাবনাকে জানতে এবং জানানোতেই ভারতীয় জীবনের সার্থকতা। সেই সার্থকতাতে নরঘাতী দস্যুও মহর্ষি বাল্মীকি হয়ে উঠতে পারেন, ''ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।... —এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।"[৬]

তিন, এখানেই একটি তত্ত্ব লক্ষ করা যায়, দস্যুর মহর্ষি হওয়ার পরের ভূমিকাটি। আলোচ্য বক্তৃতায় স্বামীজী রামকে 'অবতার' বলেছেন। পৃথিবীর জন্যই সংসারে তাঁর আগমন। মানব-সংসারে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্ট-প্রেম প্রভৃতির মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন প্রবাহিত হয়েছে। অথচ সংসারের সমস্ত অসারতাকে দেখেও তিনি প্রেমে সংসারকে আপন করে নিয়েছেন। দেবর্ষি নারদ এক দস্যুর অন্তরের দেবত্বকে জাগরিত করার জন্য বৈকুণ্ঠ ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। দস্যুও পরিবারের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মানব-সম্বন্ধের অসারতার অংশটিকে জানতে পেরে নিঃস্বার্থ অহৈতুকী

ভালবাসার খোঁজে ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন হয়েছে। তারপর পবিত্র হৃদয়ে যখন তিনি মহর্ষি হয়েছেন তখন এই পৃথিবীতেই ক্রৌঞ্চযুগলের একটি মৃত্যুতে, দয়ামায়াহীন ব্যাধের নিষ্ঠুর হত্যার অভিঘাতে শোকতপ্ত হয়ে করুণার্দ্র হৃদয়ে 'শ্লোক' উচ্চারণ করেছেন। পৃথিবীর ভালবাসার অসারতা দেখে যে-দস্যু অহৈতুকী ভালবাসার খোঁজে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন তিনিই যখন মহর্ষি হলেন তখন পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি যে-ভালবাসায় জাগ্রত হয়ে করুণার্দ্র হলেন, সে তো এই পৃথিবীরই ভালবাসা। তবে এবারের ভালবাসা আর অসার নয়। যে-অহৈতুকী ভালবাসার সন্ধানে তাঁর বহুবর্ষ যাপিত হয়েছিল, এবারের ভালবাসা সেই অহৈতুকী ভালবাসা থেকেই জাত এবং সেজন্যই নিঃস্বার্থ। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ বিরাগ এবার ফিরে এল বীততৃষ্ণ অনুরাগে—সংসারের অসারতার স্থানে প্রধান হয়ে উঠল অন্তরালে-অভ্যন্তরে থাকা দৈবী সম্ভাবনা। সেই প্রচ্ছন্ন দৈবী সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখেই জগতের কল্যাণের জন্য মহর্ষির প্রতি নির্দেশ এল : ''জগতের হিতের জন্য এইরূপ শ্লোকে রামের চরিত বর্ণনা কর।''[৭]

দ্বিতীয়ত, রামায়ণ কাহিনিতে স্বামীজী তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-পারিবারিক প্রথাগুলিকে পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সীতার বিবাহ প্রসঙ্গে স্বয়ম্বর প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতে নাটক ও সংগীতকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে অনুশীলন করা হত, কারণ ভারতবর্ষের ধারণা ছিল যেকোনও সংগীতই তন্ময় হয়ে গাইতে পারলে, ধ্যানলভ্য ফল সংগীতের দ্বারাও পাওয়া সম্ভব এবং এর দ্বারা মুক্তি পর্যন্ত হতে পারে। প্রাচীন রাজারা অশ্বমেধ ইত্যাদি বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। এইরকম যজ্ঞ বা অন্যান্য ধর্মকার্যে পত্নী ব্যতিরেকে গৃহস্থের ধর্মানুষ্ঠানে অধিকার ছিল না ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, রামায়ণের কাহিনি প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক, সহাবস্থান ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। সীতার অপহরণের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন সীতার সন্ধানে দাক্ষিণাত্যে এলেন তখন বানরদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, বানররা যেমন রাম-লক্ষ্মণের কাছে অপরিচিত ছিল তেমনি রাক্ষসদের সঙ্গেও তাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এই অপরিচিতির কারণেই আর্যরা বানর ও রাক্ষসদের কেবল দৈহিক শক্তির তারতম্যে পৃথক করত : ''আর্যগণ সে-সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না।... বন্য জাতিদিগকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান্ ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত।... 'বানর' ও 'রাক্ষস' শব্দে দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।''[৮]

এ-তথ্যটি সমকালের প্রেক্ষিতে বেশ অন্যরকম। কেননা স্বামীজী বানর ও রাক্ষসদের অনার্য বলছেন না। উপরন্তু সমকালীন ঐতিহাসিকদের একাংশ, আর্যরা বাইরে থেকে এসে অনার্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল বলে যে-ঐতিহাসিক তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিখছেন, ''কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?... রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?

''রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা

অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না?"[৯] অতএব আর্যরা বাইরে থেকে এসে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মতো অনার্যদের পরাস্ত করে ভারত দখল করেছিল, এ-মতের বিরোধিতা করেছেন যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই।[১০]

চতুর্থত, ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুঁজেছেন প্রাচীন ভারতের রাজাদের রাষ্ট্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলিও। এক্ষেত্রে সেইসময়কার শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকেও চিহ্নিত করতে পিছপা হননি। সীতা-উদ্ধারের পর অযোধ্যায় ফিরে, ''সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাণার্থে রাজাকে যে সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে সেগুলি গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবক-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তুকে কেমন মমতাশূন্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।"[১১]

ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের এই প্রজাকল্যাণকামী রূপটিকে তিনি নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করেছেন। একালে গবেষক মনে করেছেন, রামায়ণের রাজতন্ত্রে বিবেকানন্দ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের পূর্বসূচনা দেখতে পেয়েছিলেন।[১২] তা বলে রাজতন্ত্রের এই অদ্বিতীয় আধিপত্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেননি তিনি। রাজার সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনব্যবস্থা কীভাবে প্রজার সর্বনাশ করে তার উল্লেখ করেছেন : ''হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।"[১৩]

তিন

স্বামীজীর ভাবনায় রামায়ণের চরিত্রগুলিও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। হনুমানের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, স্বামীজী শৈশবে রামায়ণগানে শুনেছিলেন হনুমান কলাবাগানে থাকে; সেকথায় বিশ্বাস করে বাড়ি ফিরে কোনও কলাবাগানে হনুমানকে দেখার অপেক্ষায় অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে মঠে হনুমানের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখার সংকল্পও করেছিলেন।[১৪]

রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ছিল অগাধ একনিষ্ঠ ভক্তি। শিয়ালকোটে ভক্তি বিষয়ে বক্তৃতার সময় সেকথাই বলেছিলেন স্বামীজী : ''ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিয়াছেন : 'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।/ তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥'—আমি জানি যিনি লক্ষ্মীপতি তিনিই সীতাপতি; পরমাত্মদৃষ্টিতে উভয়ে এক। তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।"[১৫] হনুমান জ্ঞানী এবং তাঁর মধ্যে অভেদজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রামের প্রতি এই একনিষ্ঠ ভক্তিই হনুমানকে 'ভক্তশ্রেষ্ঠ' করেছে। ভক্তির এই পরাকাষ্ঠা স্বামীজীর নিজের জীবনেও দেখা যায় হনুমানের উদাহরণেই। শ্রীমা সারদা দেবী বলছেন, ''বিলেত থেকে ফিরে

এসে আমাকে [নরেন] বললে, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি...।' "[১৬]

স্বামীজী বলেছেন, ''অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন"[১৭] এবং ''ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন।"[১৮] ভগবানের নিঃস্বার্থ ভালবাসার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হওয়ার পর পবিত্রহৃদয়ে করুণাঘন দৃষ্টিতে জগতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই ব্রততে যেন মহর্ষির লোকময় ও লোকাতীত সত্তা একইসঙ্গে কার্যকর হয়েছিল। দস্যু যে-প্রেম পেয়ে বাল্মীকি হয়েছেন, সেই প্রেম যখন মাটিতে স্বয়ং রূপ ধারণ করে তখন সে-রূপ হয় রামচন্দ্রের। স্বামীজী কবিতাকারে সে-রূপের বর্ণনা দিয়েছেন :

''আচণ্ডালাপ্রতিহততরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥..."

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-কৃত পদ্যানুবাদ :

''প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে প্রবাহিত,
লোকহিতে রত সদা, হয়ে যিনি লোকাতীত,
জানকীর প্রাণবন্ধ, উপমা নাহিক যাঁর,
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু—যিনি রাম অবতার..."[১৯]

—রামচন্দ্র নিজে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ হয়েও লোকহিতে সর্বদা নিয়োজিত। মানবস্বরূপে তিনি 'প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা...।'[২০] কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশরথের সত্যরক্ষার্থে রাম এগিয়ে এসে স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করেছিলেন, সীতার প্রাণপ্রিয় তিনি কিন্তু তিনি 'সর্বোপরি আদর্শ রাজা'। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের থেকেও প্রজাদের সামূহিক কল্যাণ তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; ব্যক্তিজীবনের সবহারানোর কান্নাকে তিনি নিভৃতে পৃথক করতে পারেন। আবার মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেও ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালের প্রাণপণ সাহায্য করার চেষ্টাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেন : ''কাঠবিড়ালটির মঙ্গল হউক, সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সমান।"[২১]

বাল্মীকি দস্যু থেকে মহর্ষি হয়ে উঠেছিলেন। রাম অবতার বলেই এমন মহান হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যদি 'অবতার তত্ত্ব'কে অতিলৌকিক বলে অস্বীকারও করতে চায় তাহলেও তাকে স্তম্ভিত হয়ে দেখতে হবে কীভাবে এই পৃথিবীতেই একজন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করার সাধনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ দেবতা হয়ে উঠতে পারেন। দস্যু দেবতা হয়েছিলেন আত্মধ্যানে মগ্ন হয়ে, চোখ বুজে; রাম দেবতা হয়েছেন সংসারের মধ্যে কঠিন কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে, চোখ খুলে। তাই তো আধুনিক যুগের প্রতিভূ কবি-প্রাবন্ধিক রামের এই নিষ্কাম কর্মসাধনার মধ্যে 'পবিত্র অপার্থিবতা', 'ঐশ্বরিক উদাসীনতা' দেখতে পেয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন : ''আদিকবির নির্ভুল বাস্তবতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তিনি মহামানব নন, কিন্তু তিনি যে মানব, এই সত্যটাই মহান।"[২২]

রামায়ণের সীতাচরিত্রটি বিবেকানন্দকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিল। সীতা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য : ''সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা।"[২৩] সীতা তাঁর কাছে একটি চরিত্রমাত্র নয়, সীতা যেন একটি জাতির ঘনীভূত ভাব। সেই ভাবরূপের প্রতি স্বামীজী নিজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন : ''তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আর একটি সীতার চরিত্র বাহির

করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হন নাই। ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন।... আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা।"[২৪]

সীতাচরিত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে বিবেকানন্দ চিহ্নিত করেছেন—পবিত্রতা ও সহিষ্ণুতা। রাজকন্যা, রাজবধূ হয়েও সীতাকে আজীবন দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনবাসী হয়ে বনের কষ্টকর জীবন বেছে নিয়েছেন, রাবণের দ্বারা অপহৃতা হয়ে অশোককাননে পতিবিরহে কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়েছেন, রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পর অরণ্যে নির্বাসিত হয়েছেন, নির্বাসন থেকে ফিরে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার আদেশ পেয়েছেন। এত নিষ্ঠুর অবহেলার পর সীতা পৃথিবীমাতার বুকে চির আশ্রয় চেয়ে পেয়েছেন। মূর্তিমতী পবিত্রতা হয়েও পবিত্রতার প্রশ্নে এত অবিচার সত্ত্বেও সীতা একটি কর্কশ কথাও বলেননি—প্রাণপ্রিয় স্বামীকেও না। সীতার এই অপার সহিষ্ণুতার মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতাত্মার নিজস্বতাকে খুঁজে পেয়েছেন—"এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব।"[২৫] এ-কারণেই মহাকালী পাঠশালা দর্শনের পরে শিষ্যকে কথাপ্রসঙ্গে এদেশ সীতার দেশ বলে গর্ব করেছিলেন।[২৬] পাশ্চাত্যে যখন সীতার এই বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে ভারতীয় ভাবের কথা স্বামীজী বলছেন তখন পাশ্চাত্যের ভাবের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করছেন :

"পাশ্চাত্য দেশের বক্তব্য, 'কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' ভারতের বক্তব্য 'দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে; মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, ভারত এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা।"[২৭]

অবশ্য ভারতের এই ভাবটিকেই মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের একমাত্র অনুসরণীয় পথ বলে স্বামীজী মনে করেননি : "পাশ্চাত্যবাসীরা বলেন, 'দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করিয়া, উহা নিবারণ করিয়া আমরা দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।' ভারতবাসী বলেন, 'দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া আমরা উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া আর কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরমসুখ হইয়া দাঁড়াইবে।' যাহাই হউক, এই দুইটি আদর্শের কোনটিই হেয় নহে। কে জানে—পরিণামে কোন্ আদর্শের জয় হইবে? কে জানে—কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে? কে জানে, কোন্ ভাবকে অবলম্বন করিলে পশুভাবকে বশীভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করা সম্ভব হইবে? সহিষ্ণুতা বা ক্রিয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার?"[২৮]

বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিজ নিজ ভাবের

সমন্বয়কেই স্বামীজী নিজের জীবনব্রত বলে ঘোষণা করেন : ''পরিণামে যাহাই হউক, ইতোমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোনও আদর্শকে, কোনও প্রণালীকে, কোনও পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন-চেষ্টাই আমার জীবনব্রত। জীবনের উপত্যকার আঁকাবাঁকা পথে চলিবার সময় আমরা যেন পরস্পরকে বলিতে পারি, 'তোমার যাত্রা সফল হউক।' ''[২৯]

সুতরাং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুই ভাবের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য 'জীবনব্রত' ধারণ করেছেন বিবেকানন্দ। আপন অন্তরের দেবত্বকে আবিষ্কার করে মানুষের কল্যাণের জন্য বাল্মীকি দৈবাদেশ পেয়েছিলেন রামায়ণ রচনার, মানুষের কল্যাণের জন্য রাম দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে হেঁটেছিলেন সারাজীবন। এবার বিবেকানন্দ সকল মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মধ্যস্থিত শক্তি-সামর্থ্যকে মেলাতে চেয়েছেন। সেই মেলানোর চেষ্টায় ভারতের মহাকাব্য রামায়ণের মধ্যে প্রকাশিত পবিত্রতা, সহিষ্ণুতার আদর্শকে গ্রহণ করেছেন এবং সংসারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দৈবসত্তার উপস্থিতিকে লক্ষ রেখে সেই দৈবীসত্তাকে জানার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, এই ভাবটিকে অসাধারণ প্রজ্ঞায় চিহ্নিত করে পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। অতএব পৃথিবীর সভ্যতায় যেখানে যেখানে মানুষের ঐহিক অস্তিত্বের সঙ্গে দৈবী অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা হবে সেখানে সেখানে যদি আলোকবর্তিকার মতো সামনে রাখা যায় রামায়ণকে এবং নির্ভুলভাবে রামায়ণের সারাৎসার চিহ্নিতকারী বিবেকানন্দকে, তাহলে সাফল্য হবে অনায়াসলভ্য।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ-২৯
২। দ্রঃ *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, অন্তর্গত 'রামায়ণ', উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ৮, ২০০০, পৃঃ ১৫১ [এরপর, *বাণী ও রচনা*]
৩। তদেব, পৃঃ ১৫৩
৪। তদেব, পৃঃ ১৪৬
৫। তদেব
৬। তদেব, পৃঃ ১৪৬-৪৭
৭। তদেব
৮। তদেব, পৃঃ ১৪৯, ১৫১
৯। তদেব, খণ্ড ৬, ২০০১, পৃঃ ১৬৪
১০। দ্রঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক ইতিহাস চর্চার আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস দর্শন*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬, পৃঃ ৯৭
১১। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৮, 'রামায়ণ', পৃঃ ১৫৩
১২। দ্রঃ *ধ্রুপদী এষণা*, স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ সংখ্যা, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, ২০১১, পৃঃ ১০৪
১৩। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৭৪
১৪। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ৯, ২০০১, পৃঃ ৪৪
১৫। তদেব, খণ্ড ৫, ২০০১, পৃঃ ১৯৯
১৬। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ২০২
১৭। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৮, পৃঃ১৫২
১৮। তদেব, খণ্ড ৫, পৃঃ ১১৪
১৯। তদেব, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৯৮
২০। তদেব, খণ্ড ৫, পৃঃ ১১৪
২১। তদেব, খণ্ড ৮, পৃঃ১৫২
২২। বুদ্ধদেব বসু, *সাহিত্যচর্চা*, অন্তর্গত 'রামায়ণ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ১৯-২০
২৩। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৮, 'রামায়ণ', পৃঃ ১৫৫
২৪। তদেব, খণ্ড ৫, পৃঃ ১১৪
২৫। তদেব, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৫৬
২৬। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ৯, পৃঃ ১৮
২৭। তদেব, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৫৫
২৮। তদেব, পৃঃ ১৫৬ ২৯। তদেব